অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০২ ▪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

আলাপ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০২
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

আলাপের চতুর্থ সংখ্যায় মূল রচনা বিভাগে আছে জয়িতা পুরস্কার বিজয়ী সফল নারীদের কথা। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা সমস্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করে গেছেন তারা। জীবন গড়ার যুদ্ধে পেয়েছেন সাফল্য। জীবনকে বদলে দিতে তাদের শ্রম অন্য অনেক নারীর জন্য অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তাদের জীবন সংগ্রাম অনেকের কাছে হয়ে উঠতে পারে সাহসের দৃষ্টান্ত। সেই আট জন নারীর জীবনের সফলতার গল্প নিয়েই এবার লেখা হয়েছে মূল রচনা। এরা সবাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সাথে জড়িত। দেশের আরো অনেক সফল নারী পেয়েছেন জয়িতা পুরস্কার। আলাপের পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে তাঁদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

এই সংখ্যায় আছে সোনালী মুরগী পালন পদ্ধতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা। আছে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ির কথা।

এই সংখ্যায় মূল রচনা এবং জেনে নেই বিভাগের লেখা বিস্তারিত হওয়ায় কয়েকটি নিয়মিত বিভাগ প্রকাশিত হল না।

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারা পৃথিবীর মানুষ এই দিনটিকে উদযাপন করেছে নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে।

ফাল্গুন মাস চলছে। এই সময় ছড়িয়ে পড়ে জ্বরসহ নানা ধরণের অসুখ। সবাই নিজেরা সাবধানে থাকবেন। বাচ্চাদেরও সাবধানে রাখবেন। ■

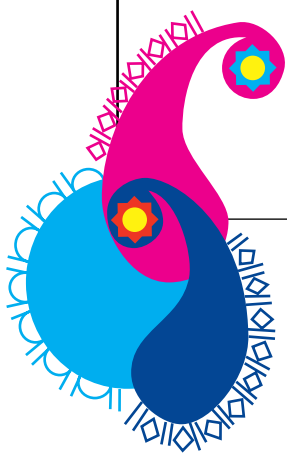

সূচিপত্র

■ তারা জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন ০১ - ০৫
■ স্যুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সমষ্টি প্রকল্প পরিদর্শন ০৬
■ সোনালী মুরগী পালন পদ্ধতি ০৭-১১
■ ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি ১২-১৩

তারা জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন

মূল রচনা

জীবনে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তারা ৮ জন সফল যোদ্ধা। প্রত্যেকেই নিজেদের কাজের জন্য পেয়েছেন 'জয়িতা' পুরস্কার। তাদের কেউ পেয়েছেন অর্থনৈতিক সাফল্য, কেউ সব বাধা সরিয়ে চালিয়ে গেছেন লেখাপড়া। কেউ আবার নতুন ভাবে শুরু করেছেন জীবন। কেউ সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে তৈরী করে হয়েছেন সফল মা। সমাজ উন্নয়নে কেউ রেখেছেন বড় ভূমিকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে এই সম্মানজনক স্বীকৃতির সূচনা করেছেন। ৫টি শ্রেণীতে অবদানের জন্য নারীদের এই পুরস্কার দেয়া হয়। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর 'বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন ও জয়িতা অন্বেষণ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের হাতে তুলে দেয়া হয় এই পুরস্কার। দেশের সব উপজেলা প্রশাসন এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মিলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) কেয়ার বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি জেলার এসডিসি সমষ্টি প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমষ্টি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ৮ জন নারী ২০১৮ সালে জয়িতা পুরস্কার পেয়েছেন। খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার ৬টি উপজেলায় এসডিসি সমষ্টি প্রকল্প কাজ করছে।

উপজেলাগুলো হচ্ছে রুপসা, কয়রা, কেশবপুর, চৌগাছা, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর। এই প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে কেয়ার বাংলাদেশ। আর্থিক সহায়তায় রয়েছে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)।

স্মৃতি বিশ্বাস

স্মৃতি বিশ্বাসের বিয়ে হয়েছিলো পাশের গ্রামের নিতাই বিশ্বাসের সঙ্গে। তার বাড়ি খুলনা জেলার রুপসা উপজেলার ডোবা গ্রামে। বিয়ের ৬ মাস পর থেকেই স্বামী শুরু করে যৌতুকের জন্য নির্যাতন। এক পর্যায়ে স্মৃতি বিশ্বাসকে তার বাবার বাড়ীতে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান নিতাই। ভারতে গিয়ে আবার বিয়েও করেন। ইতোমধ্যে স্মৃতি ছেলে সন্তানের মা হন। কিন্তু নিতাই বিশ্বাস আর দেশে ফিরে আসেনি।

এরপর স্মৃতি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য শুরু করেন সংগ্রাম। দর্জির কাজের প্রশিক্ষণ নেন তিনি। পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একই সঙ্গে মুদির দোকান ও দর্জির ব্যবসা শুরু করেন।

ছেলেকেও কষ্ট করে লেখাপড়া করান স্মৃতি। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সহায়তায় এইচ. এস.সি পাশ করে তার ছেলে। ২০১৮ সালে স্মৃতি বিশ্বাসের ছেলে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে চাকরিও পেয়ে যায়। স্মৃতি বিশ্বাসের কষ্টের দিন কেটে গেছে। তিনি এখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সঙ্গে একজন সবজি উৎপাদনকারী সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন।

পূর্ণিমা রায়

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার ডোবা গ্রামের আরেকজন নারী পূর্ণিমা রায়। তিনি স্কুলে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েন তখন তার বাবা মারা যান। উপার্জনক্ষম মানুষটির হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় অবস্থায় পড়ে। আর তখনই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী পূর্ণিমাকে বিয়ে দেয়া হয় তার অমতেই। শ্বশুর বাড়ীতে গিয়েও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন পূর্ণিমা। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি। তাই নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পূর্ণিমা ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে। কিন্তু সেখানেও সমাজের মানুষরাই লেখাপড়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একজন নারীর বেশিদূর লেখাপড়া করার ব্যাপারেই ছিলো তাদের আপত্তি। কিন্তু পূর্ণীমা কোনো বাধা মেনে নেননি। লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহ দেখে তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক পূর্ণিমার লেখা পড়ার সব দায়িত্ব নেন। ১৯৯৫ সালে পূর্ণিমা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর ভর্তি হন খুলনা রূপসা কলেজে।

বোনের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশোনা করতেন তিনি। লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতেন ছাত্র পড়িয়ে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ফকিরহাট মহিলা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। ২০০৩ সালে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পূর্ণিমা রায় এখন এনজিও কোডেক এ কাজ করছেন। পাশাপাশি যুক্ত আছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সঙ্গে একজন সবজি উৎপাদনকারী সদস্য হিসেবে।

কিংকরী অধিকারী

কিংকরী অধিকারী ২০১৮ সালে 'সফল জননী' বিভাগে শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি এখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পে একজন সবজি উৎপাদনকারী সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন।

কিংকরী অধিকারীর স্বামী দিলীপ অধিকারী তাকে ফেলে পাশের দেশ ভারতে গিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করেন। কিংকরীর সংসারে তখন দুটি সন্তান। সন্তানদের মানুষ করতে শুরু হয় কিংকরীর কঠিন জীবন সংগ্রাম। অন্যের জমিতে দৈনিক ৭ টাকা মজুরিতে কাজ করেছেন তিনি। শাকপাতা সংগ্রহ করে চলেছে তিনটি মানুষের খাওয়া। একরকম বাধ্য হয়েই মেয়েকে অল্প বয়েসে বিয়ে দেন তিনি। কষ্ট করে ছেলেকে লেখাপড়া করাতে থাকেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এক সময় কিংকরী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তার সংগ্রাম থামেনি। ছেলে একদিন শিক্ষিত হবে এই আশা বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

দানশীল ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় ছেলেকে একদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে সক্ষম হন। সেখানে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়ে তার ছেলে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী লাভ করে। ছেলেটি এখন ইতিহাসের শিক্ষক হবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ছেলের প্রাইভেট পড়ানোর টাকায় এখন কিংকরীর সংসার চলে। তাকে আর অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয় না।

তাসলিমা খাতুন

তাসলিমা খাতুন খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার শ্রীফলতলা গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে 'অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী' হিসেবে শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পে স্থানীয় সেবা প্রদানকারী

(এল.এসপি) সবজি উৎপাদনকারী দলের পরামর্শক হিসেবে যুক্ত আছেন।

এসএসসি পড়ার সময়ে বাবা মারা যায় তসলিমার। অভাবের সংসার তাদের। উপায় না পেয়ে মা বিয়ে দেন তার। স্বামীর সংসারেও অভাবের কারণে খুলনা প্রেসে কাজ নেন তসলিমা। স্বামীও একই প্রেসে কাজ করতেন। কিন্তু প্রেসের কাজ দিয়ে সংসারের অভাব কাটে না তাদের। তাই দুজনেই গ্রামে ফিরে আসেন। ২০১৩ সালে তসলিমা কাজ নেন কোডেক নামক এনজিওতে। পাশাপাশি হাঁস, মুরগী ও গরু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। জমানো কিছু টাকায় গড়ে তোলেন ৫০টি পোল্ট্রি মুরগীর একটি খামার। সেখান থেকে ভালো লাভও আসে। এরপর তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ৫০০টি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করেন। সেই মুরগীর বাচ্চা বিক্রি করে প্রায় ৬০ হাজার টাকা লাভ করেন তসলিমা। এখন তার মুরগী পালন চলছে পুরোদমে। দুইজন নারীকে সেখানে খণ্ডকালীন কাজের সুযোগও করে দিয়েছেন। তসলিমা এখন নিজের গ্রামে সবার কাছে সাহসী নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত।

আসকুরা বেগম

আসকুরা বেগম বিশ্বাস করেন স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবায়। এই আদর্শ সামনে নিয়ে আশপাশের মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পাচানী গ্রামে তার বাড়ি। তিনি ব্র্যাক-এর এনএপি স্কুল পরিচালনা করেছেন দীর্ঘ ১১ বছর। পাশাপাশি বিআরডিপি ঋণ কার্যক্রমে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে সমাজ উন্নয়নে অবদানের জন্য নারী ক্যাটাগরীতে 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা' নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সমাজ পরিবর্তন সঞ্চালক (এসসিএ) হিসেবে যুক্ত আছেন। মৃত ব্যক্তির দাফন অথবা কোনো অসুস্থ মানুষের সেবা করতে ছুটে যান তিনি। ভূমিকা রাখেন নারী নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে। বেকার মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরী করেন আসকুরা বেগম। এই ধরণের সেবার কাজ করতে গিয়ে নানান সামাজিক বাধা তাকে থামাতে পারেনি। মানুষের জন্য তার এই ভালোবাসা ভূমিকা রেখেছে সমাজ উন্নয়নে।

কনিকা রাণী সরকার

সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বরেয়া গ্রামের বাসিন্দা কনিকা রানী সরকার। তার স্বামী পরিমল সরকার অন্যের বাড়িতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পাশাপাশি সামান্য পরিমাণ জমি লিজ/বর্গা নিয়ে চলতো তার কাঁকড়া উৎপাদনের কাজ। ২০১৬ সালে কনিকা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পে কাঁকড়া উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ দলের সদস্য হন। স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (এল.এস.পি)'র মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। সমষ্টি প্রকল্পের সহায়তায় কনিকা রানী সরকার কাঁকড়া সংগ্রহ শুরু করেন। এই কাঁকড়া স্বামীর মাধ্যমে বড় আড়তে পাঠান বিক্রির জন্য। এলাকায় এখন কনিকা রানী সরকার নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ২০১৮ সালে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসেবে তিনি 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা' নির্বাচিত হয়েছেন। এখন তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের কাঁকড়া মোটাতাজা ও বাজারজাতকরণ ভেলু চেইনের একজন উৎপাদক সদস্য।

মোসামৎ নাদিরা বেগম

মোসামৎ নাদিরা বেগম যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মঙ্গলকোট গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখে তিনি 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা' পুরস্কার পেয়েছেন। নাদিরা বেগম মঙ্গলকোট ইউনিয়নের একজন নারী ইউ পি সদস্য। তিনি অনেকদিন ধরে গ্রামের অতিদরিদ্র মানুষের সেবা করছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী অফিসের সেবা পেতে তিনি এলাকার মানুষকে সাহায্য করেন। তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পে সমাজ পরিবর্তন সঞ্চালক (এসসিএ) হিসেবে যুক্ত আছেন।

মোসামৎ সালমা আকতার লিজা

মোসামৎ সালমা আকতার লিজার গ্রামের বাড়ি যশোর জেলার মির্জানগর গ্রামে। সালমা এখন এস ডি সি সমষ্টি প্রকল্পের একজন এল এস পি। ২০১৮ সালে তিনিও অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসেবে শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচিত হয়েছেন।

সালমা এখন কাজ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সঙ্গে। স্থানীয় সেবা প্রদানকারী হিসেবে তিনি গরু মোটাতাজা ও বাজারজাতকরণ ভেলু চেইনে পরামর্শক হিসেবে যুক্ত আছেন।

তিনি সাতবাড়িয়া ইউনিয়নে একজন নারী প্যারাভেট হিসাবে কাজ করছেন। ২০১৬ সালে এসডিসি সমষ্টি প্রকল্পে কাজ শুরু করেন সালমা। উপজেলা প্রানীসম্পদ বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণও নেন তিনি। প্রানীসম্পদ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সালমা গ্রামের মানুষকে প্রানীসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ দেন। গরু, ছাগল, হাস মুরগীর বিভিন্ন রোগের টিকাও দেন তিনি। এই কাজ করে তিনি প্রতি মাসে ৭০০০-৮০০০ টাকা উপার্জন করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমষ্টি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন সালমা। তিনি স্থানীয় সেবা প্রদানকারী (এল.এস.পি) হিসেবে গরু মোটাতাজা ও বাজারজাতকরণ ভেলু চেইনের পরামর্শক।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, প্রজেক্ট ম্যানেজার, এসডিসি সমষ্টি প্রজেক্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, খুলনা

নোটিশ বোর্ড

স্যুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের কেয়ার বাংলাদেশ এসডিসি - সমষ্টি প্রকল্প পরিদর্শন

স্যুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেনে হোলেন্সটিয়ান গত ১৮ ডিসেম্বর যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায় এসডিসি-সমষ্টি প্রকল্পের দুটি প্রদর্শনী (গবেষণা) পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। তিনি যশোরের কেশবপুর উপজেলার কাবিলপুর গ্রামের গাজী পাড়ায় যান গরু মোটাতাজাকরণ দলের কার্যক্রম দেখতে। পরদিন তিনি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী উত্তরপাড়া গ্রামে কাঁকড়া চাষে জড়িত চাষীদের কাজ দেখতে যান। সেখানে তিনি কাঁকড়া চাষে হ্যাঁচারীর রেণু-পোনা এবং প্রাকৃতিক রেণু-পোনা-গড় বৃদ্ধি তুলনামুলক কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

স্যুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপম্যান্ট এন্ড কো-অপারেশন-এসডিসি এর অর্থায়নে, কেয়ার বাংলাদেশ এর কারিগরী সহযোগিতায়, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার কয়েকটি উপজেলায় এসডিসি - সমষ্টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উপজেলাগুলি হচ্ছে যশোরের কেশবপুর এবং চৌগাছা, খুলনার রুপসা ও কয়রা এবং সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ এবং শ্যামনগর উপজেলা।

রাষ্ট্রদূতের পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন- তার স্ত্রী কোরনেলিয়া হোলেন্সটিয়ান, কেয়ার বাংলাদেশ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম) মি. প্রবোদ দেবকোটা, সমষ্টি প্রকল্পের সিনিয়র টিম লিডার গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞ সদরুজ্জামান তামাম। খুলনা অঞ্চলের

রাষ্ট্রদূত রেনে হোলেন্সটিয়ান কথা বলছেন সবার সঙ্গে

রিজিওনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাজেদা ইয়াছমিন, ম্যানেজার সাপোর্ট সিষ্টেম মোঃ আলমগীর হোসেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, যুগ্ন পরিচালক ও হেড অব ডিএফইডি মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রোজেক্ট ম্যানেজার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং মাঠ পর্যায়ের সমষ্টি প্রকল্পের কর্মী সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখে টিমের সকলেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অংগ সংগঠন 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট-ডিএফইডি' গরু মোটাতাজা ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। পাশাপাশি কাঁকড়া উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ খাতেও ডিএফইডি আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

সোনালী মুরগী পালন পদ্ধতি

জেনে নেই

ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) সোনালী মুরগী পালন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা দেয়। এ পর্যন্ত এই আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা পেয়েছেন ৪৩৬০ জন সোনালী মুরগী পালনকারী।

সোনালী মুরগী পালন পদ্ধতি

ঘর প্রস্তুতি

প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে খামারের জায়গা পরিষ্কার করতে হবে। তারপর ডিটারজেন্ট মেশানো পানি দিয়ে খামারের ঘর ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৬ ঘন্টা পর ডিটারজেন্ট দিয়ে ঘষে খামার পরিষ্কার করতে হবে। ময়লাগুলো দূরে গর্ত করে চাপা দিতে হবে।

এরপর জীবাণুনাশক (অমনিসাইট অ্যালডাকল জিপিসি-৮) ছিটাতে হবে খামারে। স্প্রে করা অষুধ ২৪ ঘন্টা রেখে খামারেই শুকাতে হবে। সমস্ত যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে হবে পভিডন আয়োডিন দিয়ে।

খামার সিমেন্টে তৈরি হলে তা পরিচ্ছন্ন করতে আগুনও ব্যবহার করা যায়। একটা লাঠির সামনের অংশে মোটা করে সুতির কাপড় জড়িয়ে নিতে হবে। তারপর তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে ঘরের মেঝে, তারের নেট ইত্যাদিতে আগুনের আঁচ দিতে হবে। খামারটি বাঁশ অথবা কাঠের তৈরি হলেও আগুনের আঁচ দেয়া যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন আগুন লেগে না যায়।

তারপর পুরো খামারে চুনের পানি ছিটিয়ে কমপক্ষে এক সপ্তাহ রেখে মুরগীর বাচ্চা তোলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুরগী বিক্রির পর ১ সপ্তাহ পরিষ্কার এবং ১ সপ্তাহ খালি রেখে মোট ১৫ দিনের বিরতিতে আবার বাচ্চা তুলতে হবে। তবে একই খামারে বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা একসঙ্গে ফুটানো যাবে না। এতে নানা ধরণের রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

খামারে হোভারের লাইট দুই-তিন ঘন্টা আগেই জ্বালিয়ে নিতে হবে। এক ঘন্টা পর থার্মোমিটারের রিডিং পরীক্ষা করুন। ঘরের তাপমাত্রা ৩০-৩৩ ডিগ্রি এবং হোভারের নিচের তাপমাত্রা থাকতে হবে ৩০-৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

বাচ্চা আসার ১০ মিনিট আগেই পানি এবং খাবার পাত্র যথাযথ জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে।

খাবারের পাত্রঃ ১-৭ দিন ১০০টি'র জন্য ১টি

পানির পাত্রঃ ১০০ টি'র জন্য ১টি।

প্রথম ১-২ দিন খবরের কাগজে খাবার দিতে হবে। এতে মুরগীর বাচ্চা খাবার চিনতে পারবে।

৩০ দিন পর্যন্ত ৪০ টি'র জন্য ১টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টির জন্য ১ টি পানির পাত্র প্রয়োজন হবে।

৩০ দিন পর ৩০টি বাচ্চার জন্য ১টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি'র জন্য ১টি পানির পাত্র লাগবে। খাবার এবং পানির পাত্র কিছু কম বেশি হতে পারে। তবে বেশি রাখাই ভালো।

বাচ্চা আসার পর বক্সসহ কিছুক্ষণ শেডের মধ্যে রেখে দিন (আনুমানিক ১০ মিনিট)। বাচ্চার সংখ্যা গুনে নিশ্চিত হউন আপনি সঠিক সংখ্যক বাচ্চা পেলেন কি না।

প্রথমেই দুর্বল বাচ্চা পৃথক করুন। তাদের গ্লুকোজের পানি ফোঁটা ফোঁটা করে খাইয়ে দিন। বাচ্চা সবল থাকলে প্রথম দুই ঘন্টা পানি দিলেই চলবে। বাচ্চা আসার ১০ মিনিট পর খাবার দিতে হবে। প্রথমবার খবরের কাগজ রেখে তাতে খাবার ছিটিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এরপর থেকে অবশ্যই ট্রেতে খাবার দিতে হবে।

এক ঘন্টা পর অন্তত ১০ শতাংশ বাচ্চার খাবারের থলি পরীক্ষা করুন। দেখতে হবে তাতে হালকা নরম খাবার এবং পানির মণ্ড আছে কি না। বাচ্চার পায়ের তলা আপনার শরীরে লাগিয়ে দেখুন কুসুম গরম আছে কিনা। যদি থাকে তা হলে বুঝবেন বাচ্চার ব্রোডিং যথাযথ হচ্ছে।

ব্রোডিং

বাচ্চা আসার আগে ঘরের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা ৩৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড রাখতে হবে (বাল্ব, হারিকেন, কয়লা, হিটার গ্যাস ব্রোডিং)।

ব্রোডিংয়ের তাপমাত্রা

প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট রাখা ভালো। দ্বিতীয় সপ্তাহে তা নামিয়ে আনতে হবে ৯০ডিগ্রি ফারেনহাইটে। তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে এই তাপমাত্রা থাকবে ৮৫ ডিগ্রি ও ৮০ ফিরেনহাইট। ৫ম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আমরা অনেকেই মনে করি সোনালী মুরগীকেও ব্রয়লার মুরগীর মতো সব সময় খাবার দেয়া দরকার।কিন্তু এটা ভুল ধারনা।

ব্রয়লার মুরগী যত খাবে তত ওজন হবে। অন্যদিকে সোনালী মুরগীর খাদ্যের অনেকটাই কাজে আসে না। এজন্যই সোনালি মুরগীকে সারাদিন খাবার দেয়া যাবে না।

ঘরে বচ্চা তোলার দুই ঘন্টা পর গ্লুকোজের পানি দেয়া যায়। তবে সাদা পানি দিলেও চলবে। এই পানি-ই পরবর্তী ২২ঘন্টা চলবে।

বাচ্চার অবস্থা ৩ ঘন্টা পর পর পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে তাপ বেশি হচ্ছে কি না। ৪ ঘন্টা পর খামারের পর্দা হালকা নামিয়ে গ্যাস বের করে দিতে হবে।

সোনালি মুরগীর ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০টি মুরগীতে ৪০ ব্যাগ হিসেবে সোনালি খাদ্যের ৮০০ গ্রাম গড় ওজন হিসাব করা হয়। কিন্তু সোনালি খাদ্য কখনো ২ বা ৩ ব্যাগ বেশি লাগতে পারে। আবার ২ বা ৩ ব্যাগ কমও লাগতে পারে।

যদি সোনালি মুরগীর বাচ্চাকে ব্রয়লার খাদ্য খাওয়ানো হয় তবে ১০০০টি মুরগীর জন্য সর্বোচ্চ ৩৪-৩৫ ব্যাগ খাবারের ৮০০ গ্রাম গড় ওজন হিসাব করা হয়। এক্ষেত্রে আগের মতই ২ থেকে ৩ ব্যাগের যোগ বা বিয়োগ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তবে ব্রয়লার খাবারে প্রোটিন বেশি থাকায় মুরগীর আমাশয় এবং সাদা আমাশয় রোগ বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্রয়লার এবং সোনালি খাদ্য মিশিয়ে যথাক্রমে ৩৫

শতাংশ এবং ৬৫ শতাংশ হারে খাওয়ানো যেতে পারে।

সারাদিনে খাবার দেয়ার নিয়ম

বাচ্চাকে দিনে ৩ বার খাবার দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে, সকালে সর্বোচ্চ ৪ ঘন্টার মধ্যে যাতে খাবার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। দুপুরে খাবার সর্বোচ্চ ৩ঘন্টার মধ্যে শেষ হতে হবে। রাতের খাবার খাবে সর্বোচ্চ ৫ ঘন্টা।

প্রয়োজনে মুরগীর ক্রপ (খাদ্য থলি) পরীক্ষা করে খাদ্য দিতে হবে। যদি থলি ভর্তি থাকে তবে খাবার না-দেয়া ভালো। মনে রাখবেন, সোনালি মুরগীকে যতই খেতে দেয়া হবে তারা ততোই খাবে। কিন্তু এতে খাদ্য অপচয় হয়।

৩য় সপ্তাহ বয়সের মুরগীকে ২০-২২ গ্রাম খাবার দিতে হবে। পরবর্তী প্রতি সপ্তাহে ৪-৬ গ্রাম হারে খাবার বাড়িয়ে দিতে হবে। এদের দিনের খাবারের পরিমাণকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর ওই খাবারের ৪০শতাংশ সকালে ২০ শতাংশ দুপুরে এবং ৪০ শতাংশ রাতে দিতে হবে। এ-হিসেবে খাবার খাওয়ালে খাবারে অপচয় বন্ধ হবে।

সোনালী মুরগীর ভ্যাকসিন এবং ওষুধ

সুস্থ মুরগীকে ওষুধ না খাওয়ানো উচিত। ভালো পরিবেশে থাকলে আপনার মুরগীর স্বাস্থ্য ওষুধ ছাড়াই ভালো থাকবে। খামারের পরিবেশ, পরিস্কার খাবার পানি আপনার ওষুধের খরচ ৭০ শতাংশ কমিয়ে দেবে।

খামারের মেঝে এবং ফার্মের পাশে ৫ ফুট দূরত্বে লবণ পানি দিতে হবে। প্রতি ১০০ লিটার পানিতে ৫০০গ্রাম লবণ মিশাতে হবে। ওই পানি শুকানোর পর ১ কেজি চুন প্রতি ১০০০বর্গ ফুট জায়গা অনুযায়ী মাটিতে লেপবেন। সেটা শুকানোর পর যে কোন ভাল জীবাণুনাশক দিয়ে ঘরের সব কিছুতে স্প্রে করবেন।

পানি টেস্ট করিয়ে নেবেন। ব্যাক্টেরিয়া অথবা আয়রণের পরিমাণ জানতে এ ধরণের পরীক্ষা জরুরী। পরে সে অনুযায়ী পানি বিশুদ্ধকরণ করতে হবে।

সোনালি মুরগীর ভ্যাকসিন

রানীক্ষেত রোগের ক্ষেত্রে মুরগীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে অবশ্যই ভ্যাক্সিনের ডোজ ১০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। এরপর ভিটামিন বি-১ বিহীন লিভার টনিক এবং ভিটামিন সি ব্যবহার করবেন। যদি মুরগী কৃমি আক্রান্ত হয় তবে ভ্যাকসিন কাজ করবে না। মুরগী সালমোনেলা-ই, কোলাই কিংবা মাইকোপ্লাজমা দ্বারা আক্রান্ত হলেও কোন ওষুধ কাজে আসবে না।

লিটার এবং রোগ

শীতের সময় লিটার ৩ ইঞ্চি এবং গরমের সময় ২ ইঞ্চি করে দিলে ভালো হয় কারণ লিটার পাতলা হলে বাচ্চার শরীরের তাপ বের হয়ে লিটারে চলে যায়। লিটার ভেজা হলে আমাশয় রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। মুরগীর অমাশয় হলে গামবূরু ভ্যাকসিন দিতে হবে। লিটার বেশি শুকনা হলে স্প্রে করে দিতে হবে কারণ ধূলাবালি নাকে গিয়ে মুরগীর ঠাণ্ডা লাগে। বিশেষ করে বাচ্চার ব্রুডার নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

খাবার ও পানির পাত্র এবং রোগ

খাবার পাত্র দিতে হবে মুরগীর বাচ্চার পিঠ বরাবর আর পানির পাত্র রাখতে হবে চোখ বরাবর। তাহলে তারা সহজে খেতে পারবে। পানি ও খাবারে ময়লা কম পড়লে পানিবাহিত রোগ কম হয়। এতে মুরগীর পেট ভাল থাকে এবং ওজনও বাড়ে। লিটার যদি খাবার এবং পানিতে পড়ে তাহলে মুরগীর আমাশয় রোগ হয়। প্রতিদিন এদের পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হবে এবং সপ্তাহে ১ বার খাবার পাত্র পরিষ্কার করতে হবে।

পর্দা এবং রোগ

খামারের পর্দার নিচের অংশ স্থির থাকবে সবসময়। পর্দা উপর থেকে নিচে নামানো হবে। পর্দার উপরের অংশও যদি স্থির থাকে তাহলে তা সঠিকভাবে উঠানো নামানো যায় না। আর তাতে বাতাস আটকে খামারের ভেতরে গ্যাস জমা হয়। এই গ্যাস মুরগীর শ্বাসনালীতে মাওকোপ্লাজমা, ব্রংকাইটিস এবং রাণিক্ষেত রোগের জন্ম দেয়।

রোগ ব্যাধি

মুরগীর প্রধান রোগ হলো আমাশয়, গামবোরু, রাণিক্ষেত। তাছাড়া মাইকোপ্লাজমা এবং ব্রংকাইটিস।

ওষুধ

খামারে মুরগীর আমাশয় বেশি হয়। তাই ১৩-১৫ দিনে, ২৩-২৫ দিনে এবং ৩৫-৩৭ দিনে মোট তিন বার আমাশয়ের ওষুধ দেয়া উচিত।

৩৫-৪০ দিনের মাথায় কৃমির ওষুধ দিলে ভালো। ব্রিডিং এর সময় প্রথম দিন প্রবায়োটিক সি এবং গ্লুকোজ দেয়া যায়। পরে প্রয়োজন হলে এন্টিবায়োটিক দেয়া যায়। প্রতি সপ্তাহ

মোঃ খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, প্রধান কার্যালয়, ডিএফইডি

আমাদের দেশে

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ি

গিরিশ চন্দ্র সেন নামে মানুষটি বাংলাদেশে পরিচিত 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামে। তিনি-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। তিনি কোরআন শরিফকে ১২ খণ্ডে ভাগ করে অনুবাদ করেন। ১৮৮১ সালে কোরআন শরিফের ১ম খণ্ড অনুবাদকের নাম ছাড়া প্রকাশিত হয়। তখনকার মুসলিম আলেম সমাজ এই মহৎ কাজটির জন্য ব্রাহ্মসমাজকে প্রশংসা করেন। ১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র সেন পবিত্র কোরআন শরিফের বাংলা অনুবাদ নিজের নামে প্রকাশ করেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়িটি অনেকদিন ধরে বেশ জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিলো। ঐতিহ্য অন্বেষণ নামক একটি সংগঠন ২০১২ সালে জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহোযগিতায় বাড়িটি জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয়। জাদুঘরটি সর্ম্পকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন জনাব কওছারুল হক (কানন), পরিচালক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন জাদুঘর।

প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন জাদুঘরটি দেখতে। আপনি চাইলেও একদিন সময় করে দেখে আসতে পারেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন জাদুঘর। রাজধানী ঢাকা থেকে নরসিংদী জেলার সঙ্গে বিভিন্ন রুটে বাস যোগাযোগ আছে। সরাসরি বাস করে এসে নামতে হবে

গিরিশচন্দ্র সেন

নরসিংদীর পাচঁদোনায়। সেখান থেকে অল্প দূরত্বেই ভাই গিরিশচন্দ্র সেন জাদুঘ র।

গিরিশ চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৩৪ সালে নরসিংদী জেলার পাচঁদোনা গ্রামে। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছোট। মাত্র বার বছর বয়সে ময়মনসিংহ ডেপুটি রেজিষ্ট্রি অফিসে কাজ শুরু করেন। তারপর নর্মাল স্কুলের পাঠ শেষ করে ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলে শিক্ষক পদে যোগ দেন। ১৮৭৫ সালে চাকরি ছেড়ে গিরিশচন্দ্র চলে যান কলকাতায়। কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। শৈশবে বাংলা, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। মৌলভী এহসান আলীর আরবি ব্যাকরণ দিওয়ান-ই-হাফিজ পড়েই আরবি ভাষা শিখতে শুরু করেন তিনি।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোরআন শরিফের অনুবাদ অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদের মত সরল নয়। কাজটা করতে ইসলাম ধর্ম সর্ম্পকে সঠিক ধারনা থাকতে হবে। তাই তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখাপড়াও করেন। তিনি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ এবং পবিত্র কোরআন শরিফের বাছাই করা আয়াত অনুবাদ করতে থাকেন। এভাবে তিনি নিজেকে পূর্নাঙ্গ অনুবাদ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ির বয়স প্রায় ২০০ বছর। জাদুঘরে তার অনুবাদ করা কয়েকটি কোরআন শরিফ ও অন্যন্য বই রাখা আছে। পাশাপাশি তাঁর ব্যবহারের নানান জিনিস জাদুঘরে আছে। তিনি ১৯১০ সালে মারা যান।

গিরিশচন্দ্র সেনের বাড়ির একটি ঘর

সুব্রত কুমার সরকার, ব্রাঞ্চ হিসাব রক্ষক, পাঁচদোনা শাখা, ডিএফইডি

ছবিটি এঁকেছে: মোঃ জান্নাতি ইসলাম
দ্বিতীয় শ্রেণি, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র, মায়ের নামঃ রোকসানা বেগম, *দলের নামঃ যমুনা*
ডিএফইডি, মনোহরদী শাখা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission